Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে কবি-প্রসিদ্ধি

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	চুনীলাল রায় চৌধুরী
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.7
Pages	161-172
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে কবি–প্রসিদ্ধি

চুনীলাল রায় চৌধুরী

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ধ্বনিবাদ। সুতরাং ধ্বন্যালোককে কেন্দ্রবিন্দু ধরে অলংকারশাস্ত্রের সমগ্র ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে--প্রাক্‌–ধ্বনিপর্ব, ধ্বনিপর্ব ও উত্তর–ধ্বনিপর্ব। প্রাক্‌–ধ্বনিপর্বের আলংকারিকদের মধ্যে ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট বামন, রুদ্রট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ভরত রসবাদের, ভামহ অলংকারসম্প্রদায়ের এবং দণ্ডী রীতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা। নবম শতক সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই রচিত হয় ধ্বনিবাদের বিখ্যাত গ্রন্থ *ধ্বন্যালোক*। ধ্বনিবাদের মূল কথা হচ্ছে ধ্বনিই কাব্যের আত্মা অর্থাৎ কাব্যকলার সারবস্তু। আনন্দবর্ধনের পরবর্তী আলংকারিকদের মধ্যে বক্রোক্তিবাদের প্রবর্তকরূপে কুন্তকের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। অন্যান্যদের মধ্যে মম্মট ভট্ট শাণিত বুদ্ধির দীপ্তিতে পুরাতন তত্ত্বকে নতুন করে যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া সকলেই রচনা করেছেন সংকলন গ্রন্থ, অলংকারশাস্ত্রের ভাণ্ডারে নতুন কিছু সম্পদ দান করতে তাঁরা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:

> সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের আপেক্ষিক অসাফল্যের জন্য রসবেত্তারা দায়ী নন, উপযুক্ত দৃষ্টান্তের অভাবে তাঁহাদের রসগ্রাহিতা পূর্ণমাত্রায় অনুশীলিত হইবার

> সুযোগ পায় নাই। আলংকারিক সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ হইবার পর এমন কোন মৌলিক প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব হয় নাই, যিনি ঐ পুরাতন সূত্র সমূহের নব প্রয়োগ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (*সমালোচনা সাহিত্য*, গ্রন্থ পরিচিতি, পৃ ৫)

কালিদাসোত্তর কালে ভারবিভর্তৃহরি, মাঘ ও শ্রীহর্ষ ব্যতীত অন্য কোন মৌলিক প্রতিভাধর কবির পরিচয় পাওয়া যায় না।

> অনেকেই লোকবৃত্তজ্ঞানের জন্য নির্ভর করিতেন পুরাতন কবিগণের কাব্যের উপর, 'কবিসময়' শাস্ত্রের উপর, ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছে, সে সকল রচনায় বাগ্‌ভঙ্গীর বৈচিত্র্য লক্ষিত হইলেও প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা–প্রসূত অর্থের যে নবীনতা ও বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য রামায়ণ বা মহাভারতের প্রতিছত্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে তাহার একান্তই অভাব। ইহাদের প্রত্যেকেরই বর্ণনীয় অর্থ একজাতীয়– সকলের দৃষ্টিতেই মুখটি চাঁদের মত, নয়নদ্বয় ভৃঙ্গযুগলের ন্যায়, ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলসদৃশ আলোহিত, বর্ণনার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোথাও সংস্পর্শ লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। (*প্রাচীন ভারতের কবিচর্য্যা*, কাব্যকৌতুক, পৃ ৯)

এ জন্যই অবক্ষয় যুগের সংস্কৃত কাব্যের লক্ষণ[১] নির্দেশ করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকবি বলেছেন যে, কাব্য 'কবিসময়' অনুসারে রচিত হবে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উথাপিত হতে পারে কবিসময় বা কবিপ্রসিদ্ধির স্বরূপ কি?

কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি গ্রন্থের পঞ্চম অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে বামনাচার্য কাব্যসময়ের উল্লেখ করেছেন।

গোপেন্দ্র তিল্ম ভূপাল *কামধেনু'* টীকায় এর ব্যাখ্যা করে বলেন, ''সময়ঃ =সঙ্কেতং, প্রয়োগবর্জ্যাবর্জ্যনিয়ম ইতি যাবৎ'' (পৃ ১৬১)

অর্থাৎ কাব্যরচনায় বর্জনীয় ও অবর্জনীয় বিষয়ের নিয়মই হচ্ছে কাব্যসময়। এ প্রসঙ্গে বামন *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করেছেন :

১। নৈকং পদং দ্বিঃ প্রযোজ্যং প্রায়েণ (৫।১।১)- একই পদ কাব্যে দুবার ব্যবহার করা বিধিসম্মত নয়। কারণ এর ফলে কাব্যের চারুতা ব্যাহত হয়। কিন্তু অনুপ্রাস ও যমকালংকারে একই পদের দ্বিরুক্তি আদৌ দূষণীয় নয়।

২। নিত্যং সংহিতৈকপদবৎ পাদেষ্বর্ধান্তবর্জনম্ ।। (৫।১।২)--একপদে সন্ধি অবশ্যকর্তব্য, কিন্তু কোন শ্লোকে একটি পাদের অন্তবর্ণের সঙ্গে পরবর্তী পাদের আদিবর্ণের সন্ধি বর্জন করা উচিত।

৩। ন পাদান্তলঘোর্গুরুত্বং চ সর্বত্র ।। (৫।১।৩)--ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী পাদের অন্তঃস্থিত লঘুবর্ণ বিকল্পে গুরু এবং গুরুবর্ণ বিকল্পে লঘু হয়। কিন্তু বামনাচার্যের অভিমত অনুযায়ী এ নিয়ম সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪। ন পাদাদৌ খল্বাদয়ঃ ।। (৫।১।৫)--পাদের আদিতে 'খলু' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ নয়। কিন্তু বত, হন্ত প্রভৃতি শব্দ খল্বাদিবাচক নয় বলে পাদের প্রারম্ভে এদের প্রয়োগ দোষাবহ নয়।

৫। ন কর্মধারয়ো বহুব্রীহিপ্রতিপত্তি করঃ। (৫।১।৭)--বহুব্রীহির প্রতীতি জন্মে এমন কর্মধারয় সমাসের প্রয়োগ বর্জনীয়।

৬। তেন বিপর্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ ।। (৫।১।৮)--পূর্বোক্ত সূত্রের বিপর্যয়ে অর্থাৎ কর্মধারয়ের প্রতীতি জন্মে এরূপ বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ দূষণীয়।

৭। অতিপ্রযুক্তং দেশভাষাপদম্ ।। (৫।১।১৩)--কবিগণ কর্তৃক অতিপ্রযুক্ত দেশজ শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অনতিপ্রসিদ্ধ দেশজ শব্দের প্রয়োগ বর্জনীয় -- অনতিপ্রযুক্তং তু ন প্রযোজ্যম্--(৫।১।১৩, বৃত্তি)।

৮। লক্ষণাশব্দাশ্চ ।। (৫।১।১৫)-- অতিপ্রযুক্ত লক্ষণাশব্দ প্রযোজ্য, কিন্তু অনতি প্রযোজ্য লক্ষণাশব্দ বর্জনীয়।

৯। ন তদ্‌বাহুল্যমে কত্র ।। (৫।১।১৬)--একই বাক্যে লক্ষণাশব্দের বহুল প্রয়োগ পরিহার্য।

এই সূত্রগুলি থেকে প্রতীত হয় যে প্রধানত ছন্দ ও ব্যাকরণগত ত্রুটি এড়ানোর জন্য বামন কাব্যসময় শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বামন কর্তৃক আলোচিত 'কাব্যসময়' ও পরবর্তী আলংকারিকগণের 'কবিসময়' এক বিষয় নয়।

সর্ব প্রথম রাজশেখর *'কাব্যমীমাংসা'* গ্রন্থে 'কবিসময়' বা কবিপ্রসিদ্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন এবং এর রূপ- বৈচিত্র্য উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ''অশাস্ত্রীয়মলৌকিকং চ পরম্পরায়াতং যমর্থমুপনিবধ্নন্তি কবয়ঃ স কবিসময়ঃ।'' (পৃ ৭৮)--অর্থাৎ শাস্ত্রেও নেই বা লৌকিক জীবনেও দেখা যায় না এমন কতকগুলি বিষয় কবিরা পরম্পরাক্রমে তাঁদের কাব্যে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রয়োগগুলিকে বলা হয় 'কবিসময়' যা 'কবিপ্রসিদ্ধি'।

উদ্ধৃত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কবি-প্রসিদ্ধির বিশেষণ তিনটি--অশাস্ত্রীয়, অলৌকিক ও পরম্পরায়াত। অশাস্ত্রীয় ও অলৌকিক এ বিশেষণ দুটি থাকায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে যাকে রাজশেখর বলেছেন 'কবিসময়' তাকেই কি ভামহ এবং দণ্ডী অন্তর্ভুক্ত করেছেন 'দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধী' (*কাব্যালংকার*

৪।২, *কাব্যাদর্শ* ৩।১৬২-১৬৪) দোষের মধ্যে এবং বামন 'লোকবিরুদ্ধ' ও বিদ্যাবিরুদ্ধ' (*কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* ২।২।২৩-২৪) দোষের মধ্যে?

এখানে ভামহ এবং দণ্ডী প্রকৃতপক্ষে ছটি দোষের কথা বলেছেন: দেশবিরোধী, কালবিরোধী, কলাবিরোধী, লোকবিরোধী, ন্যায়বিরোধী ও আগমবিরোধী। যে-দেশে যে-দ্রব্য জন্মে বা জন্মে না বলে প্রসিদ্ধি আছে তার বিপরীত বর্ণনাকে বলে দেশবিরোধী। অনুরূপভাবে যে-কালে যে-দ্রব্য জন্মে না সে-কালে সে-দ্রব্যের বর্ণনাকে বলা হয় কালবিরোধী। কাব্যে সংগীত প্রভৃতি বিভিন্ন কলাবিদ্যার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ভুল তথ্যের পরিবেশনকে বলা হয় কলাবিরোধী। বাস্তবজীবনে যা ঘটেনা এমন কিছুর বর্ণনাকে বলা হয় লোকবিরোধী। ন্যায় বলতে ভামহ বুঝেছেন ধর্ম, অর্থ ও কামবিষয়কশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতি--''ন্যায়ঃ শাস্ত্রং ত্রিবর্গোক্তির্দণ্ডনীতিং চ তাং বিদুঃ'' (*কাব্যালংকার* ৪।৩৮)। দণ্ডীর মতে ন্যায় হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্র--''হেতুবিদ্যাত্মকো ন্যায়ঃ'' (*কাব্যাদর্শ* ৩।১৬৩)। সুতরাং শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন ভুল তথ্যের পরিবেশনকেই মোটামুটিভাবে ন্যায়বিরোধী বলা যায়। যা ধর্মশাস্ত্র-অনুমোদিত লোকাচারকে লংঘন করে তার বর্ণনাকেই ভামহ বলেছেন আগমবিরোধী।

আগমো ধর্মশাস্ত্রাণি লোকসীমা চ তৎকৃতা।
তদ্বিরোধি তদাচারব্যতিক্রমণতো যথা।।

— *কাব্যালংকার* ৪।৪৭

দণ্ডীও শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রবিরোধী বিষয়ের বর্ণনাকে বলেছেন আগমবিরোধী (সস্মৃতিঃ শ্রুতিরাগমঃ,--*কাব্যাদর্শ* ৩।১৬৮)। ভামহ এবং দণ্ডীর দেশবিরোধী, কালবিরোধী ও লোকবিরোধীকে একত্র

করে বামন নাম দিয়েছেন 'লোকবিরুদ্ধ' এবং কলাবিরোধী ও আগমবিরোধীকে বলেছেন 'বিদ্যাবিরুদ্ধ' (''দেশকালস্বভাববিরুদ্ধার্থানি লোকবিরুদ্ধানি''—*কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* ২।২।২৩; ''কলাচতুর্বর্গশাস্ত্রবিরুদ্ধার্থানি বিদ্যাবিরুদ্ধানি''—*কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তি* ২।২।২৪)।

সুতরাং দেখা যায় যে বাস্তব জীবন ও বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে ভুল তথ্যের পরিবেশনকেই ভামহ, দণ্ডী ও বামন বলেছেন দেশবিরোধী প্রভৃতি দোষ।

ভুল তথ্যের পরিবেশন যদি দোষ হয়, তাহলে দণ্ডীর এই শ্লোকটিকে দোষযুক্ত না বলে পারা যায় না:

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীনাদ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ।।
—*কাব্যাদর্শ* ২।২১৫

জ্যোৎস্নারাতে অভিসারে চলেছে অভিসারিকার দল। পরনে তাদের সিল্কের শাড়ি, সর্বাঙ্গে চন্দনের অনুলেপন, মল্লিকার মালায় ভরে গেছে তাদের সারা দেহ। শাড়ির জলুস, চন্দনের রং, ফুলের শুভ্রতা আর চাঁদের আলো সব কিছু মিলে এমন একাকার হয়ে গিয়েছে যে অভিসারিকা আর নজরেই পড়ছে না। কিন্তু বাস্তবে তো সব কিছু মিলে মিশে এক হয়ে যায় না। এই শ্লোকটি কি লোকবিরোধী দোষের উদাহরণ নয়?

দণ্ডী কিন্তু এই শ্লোকটিকে উপস্থাপন করেছেন অতিশয়োক্তি অলংকারের উদাহরণ রূপে। তিনি এই অলংকারের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন:

বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্ত্তিনী।
অসাবতিশয়োক্তিঃ স্যাদলংকারোত্তমা যথা।।
–*কাব্যাদর্শ* ২।২১৪

যেখানে কোন বিষয়ের বর্ণনায় লোকসীমা লংঘন করা হয়, কিন্তু সেই সীমালংঘনের পেছনে থাকে বিশেষ কিছুকে প্রকাশ করার ইচ্ছা, সেখানে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। ভামহও ঐ একই কথা বলেছেন: নিমিত্ততো বচো যত্তু লোকাতিক্রান্ত গোচরম্ (*কাব্যালংকার* ২।৮১) ––অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন লোকসীমা লংঘন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় অতিশয়োক্তি অলংকার। 'মল্লিকামালভারিণ্যঃ' প্রভৃতি শ্লোকে লৌকিক সীমা নিশ্চয়ই লংঘিত হয়েছে, কিন্তু এই সীমা লংঘনের পেছনে কবির কোন খামখেয়াল নেই, আছে বিশেষ কিছুকে ভাষায় প্রকাশ করার দুর্নিবার ইচ্ছা। রসনিবিড় কবি হৃদয়ের এই যে 'বিশেষস্য বিবক্ষা' তাকে ছাঁচে–ঢালা আটপৌরে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাই কবিকে লংঘন করতে হয় লৌকিক জগতের সীমাকে। এজন্যই এ ক্ষেত্রে লোকসীমা অতিক্রম করলেও দোষ হয় না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে গুণও হতে পারে:

বিরোধঃ সকলোপ্যেষ কদাচিৎ কবিকৌশলাৎ।
উৎক্রম্য দোষগণনাং গুণবীথিং বিগাহতে।।
–*কাব্যাদর্শ* ৩।১৭৯

ভামহ, দণ্ডী ও বামনের দেশবিরোধী প্রভৃতি দোষ এবং রাজশেখর–বর্ণিত কবি–প্রসিদ্ধি এই উভয়ের মধ্যে রয়েছে শাস্ত্রসীমা ও লোকসীমার লংঘন। কিন্তু কবি–প্রসিদ্ধিগুলিতে রয়েছে কবির 'বিশেষস্য বিবক্ষা' যার যাদুস্পর্শে ভাষা হয়ে ওঠে কাব্য। অপরপক্ষে

দেশবিরোধী প্রভৃতি দোষগুলিতে কবির 'বিশেষস্য বিবক্ষা' নেই যার ফলে এরা রসঘন কবি-হৃদয়ের বাণী-রূপ হয়ে উঠতে পারে নি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কবি-প্রতিভার যাদুস্পর্শে যদি কবি-সময়ের জন্ম হয়, তাহলে একে 'পরম্পরায়াত' বলা হল কেন? যে জিনিস পরম্পরাক্রমে এক কবির হাত থেকে আরেক কবির হাতে এসে পৌছায় তা ছকে বাঁধা হতে বাধ্য। যা ছকে বাঁধা তাতে প্রতিভার স্পর্শ থাকতেই পারে না। এর উত্তর হচ্ছে--জন্মলগ্নে প্রত্যেকটি কবি-সময়ই ছিল বাঁধন-ভাঙা প্রাতিভ সৃষ্টি। কিন্তু টাকার মত কবিদের হাত ফেরত হতে হতে তার সমস্ত জলুস নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 'মুখচন্দ্র' এই চিত্রকল্পটি জন্মলগ্নে অবশ্যই অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু 'পরম্পরায়াত' হওয়ার ফলে আজ আর সেই সাড়া জাগাতে পারে না।

কবি-প্রসিদ্ধিগুলির কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। রাজশেখর এগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন--১। স্বর্গীয় অর্থাৎ স্বর্গসম্বন্ধীয়, ২। ভৌম অর্থাৎ পৃথিবী সম্বন্ধীয় এবং ৩। পাতালীয় অর্থাৎ পাতাল সম্বন্ধীয়। কাব্যে ভৌম কবি-প্রসিদ্ধির গণ্ডী বেশ বিস্তৃত। এর প্রধান বিভাগ চারটি--জাতিরূপ, গুণরূপ, ক্রিয়ারূপ ও দ্রব্যরূপ। এই চারটি ভেদের মধ্যে রাজশেখর গুণসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধি সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন সর্বাপেক্ষা বেশি। *কাব্যমীমাংসার* পঞ্চদশ অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন তিনি 'গুণসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধি'। যেমন যশ ও হাস্যবর্ণনায় শ্বেতবর্ণ, পাপ ও কুকীর্তির বর্ণনায় কৃষ্ণবর্ণ, ক্রোধ ও অনুরাগ বর্ণনায় রক্তবর্ণ প্রভৃতি। কোন গুণ বা বর্ণ বর্তমান থাকলেও তার উল্লেখ না করাকে আরেক প্রকার গুণসম্বন্ধী কবি-

প্রসিদ্ধি বলা হয়। যেমন--কুন্দকলিকা ও কামিদণ্ডের রক্তবর্ণ, পদ্মকলিকার হরিদবর্ণ, প্রিয়ঙ্গুপুষ্পের পীতবর্ণ থাকা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। বিশেষস্থলে বিশেষগুণের বর্ণনাও আরেক প্রকার গুণসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধি। যেমন--মাণিক্যের রক্তবর্ণ, পুষ্পের শ্বেতবর্ণ ও মেঘের কৃষ্ণবর্ণের বর্ণনা। কৃষ্ণ ও নীল, কৃষ্ণ ও হরিৎ, কৃষ্ণ ও শ্যাম, পীত ও রক্ত, শ্বেত ও গৌর বর্ণের সাম্যবর্ণনাও গুণসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধি। একই বিষয়ের বর্ণনায় নানা বর্ণের উল্লেখও গুণসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধির অন্তর্গত। যেমন—চক্ষুবর্ণনায় শ্যাম, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ।

জাতি প্রভৃতি কবি-প্রসিদ্ধির তিনটি উপবিভাগ-- ১। অসতো নিবন্ধনম্ অর্থাৎ যা অসৎ বা সত্যি নেই তার বর্ণনা; যেমন--নদীজলে পদ্ম ও কুমুদ, জলাশয়মাত্রই হংস এবং পর্বতমাত্রই স্বর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা। ২। সতোহপি অনিবন্ধনম্ অর্থাৎ যে-স্থানে যে-কালে যে-বস্তু সত্যি আছে সে-স্থানে বা সে-কালে সে-বস্তুর বর্ণনা না করা; যেমন, বসন্তকালে মালতী ফুল, চন্দন বৃক্ষে ফুল ও ফল, অশোকবৃক্ষে ফল প্রভৃতির বর্ণনা না করা, ৩। নিয়মেন নিবন্ধনম্ অর্থাৎ অনেকস্থলে পাওয়া গেলেও কোন বস্তু সম্পর্কে একটি বিশেষ স্থানের উল্লেখ কিংবা কোন ব্যাপার বিভিন্ন সময়ে ঘটলেও কোন বিশেষ সময়ে তাকে নির্দিষ্ট করে বলা; যেমন বহুস্থানে চন্দনের উৎপত্তি হলেও একমাত্র মলয়পর্বতকেই উৎপত্তিস্থলরূপে উল্লেখ করা; গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুতে কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা গেলেও একমাত্র বসন্তকালেই তার বর্ণনা, অন্য সময়ে ময়ূরের নৃত্য ও কেকাধ্বনি থাকলেও কেবল বর্ষাকালেই তার উল্লেখ প্রভৃতি।

কাব্যমীমাংসার ষোড়শ অধ্যায়ে রাজশেখর কয়েকটি স্বর্গীয় কবি-প্রসিদ্ধিরও উল্লেখ করেছেন; যেমন, চন্দ্র বর্ণনায় শশক ও

মৃগের ঐক্য, কামদেবের পতাকা বর্ণনায় মকর ও মৎস্যের সাম্য, অত্রিনয়নসম্ভূত ও সমুদ্রোত্থিত চন্দ্রের অভিন্নতা কল্পনা প্রভৃতি স্বর্গবিষয়ক কবি-প্রসিদ্ধির অন্তর্গত।

স্বর্গীয় ও ভৌমবিষয়ের মত পাতালবিষয়েও কিছু কবি-প্রসিদ্ধি রয়েছে। এগুলিকে বলা হয় পাতালসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধি। যেমন, নাগ ও সর্প দুটি ভিন্ন প্রজাতি হলেও কবিগণ তাঁদের রচনায় অনেক সময় নাগ শব্দটি সর্প শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করে থাকেন। আবার দৈত্য, দানব ও অসুরের প্রকৃতি ভিন্ন হলেও এই তিন প্রজাতির মধ্যে অভিন্নত্ব কল্পনাও এক প্রকার পাতালসম্বন্ধী কবি-প্রসিদ্ধি।

রাজশেখরের এই বিস্তৃত আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরবর্তী যে সব গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে সেগুলি হল জিনসেনের '*অলংকারচিন্তামনি*', অমরের '*কাব্যকল্পলতাবৃত্তি*', দেবেশ্বরের '*কবিকল্পলতা*', হেমচন্দ্রের '*কাব্যানুশাসন*', কেশবমিশ্রের '*অলংকারশেখর*' প্রভৃতি। জিনসেন, হেমচন্দ্র ও কেশব মিশ্র কবি-প্রসিদ্ধিগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন--অসতো নিবন্ধনম্, সতোহপি অনিবন্ধনম্ এবং নিয়মেন নিবন্ধনম্। এই তিনজন আলংকারিক ছাড়া বাকি সকলে *কাব্যমীমাংসার* ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত স্বর্গীয় ও পাতালীয় কবি-প্রসিদ্ধিগুলিকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং অমর ও দেবেশ্বর এই চতুর্থ শ্রেণীকে বলেছেন 'নিয়মবিশেষ'।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন ভাষা যখন তার জীবনী-শক্তি হারিয়ে মৃতকল্প হয়ে পড়ে, তখন সে ভাষায় রচিত হয় না কোন সৃজনশীল সাহিত্য, হয় না কোন উন্মেষশালিনী

প্রতিভার বিকাশ। কবি ও সাহিত্যিকগণকে তখন নির্ভরশীল হতে হয় কবি–প্রসিদ্ধির ওপর। ফলে যে সাহিত্য বা কাব্য রচিত হয় তা হয় পূর্বাচার্যগণের অন্ধ অনুকরণ বা চর্বিতচর্বণ, তাতে থাকে না কোন অভিনব চিত্রকল্প বা বাগ্‌বিন্যাস।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অমর চন্দ্র : *কাব্যকল্পলতাবৃত্তি*, রামশাস্ত্রী সম্পাদিত, কাশী, ১৯৪২

আনন্দ বর্ধন : *ধ্বন্যালোক*, দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গপরব সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর, ১৯৩৫

উদ্ভট : *কাব্যালংকারসারসংগ্রহ* , নারায়ণ দাশো বনহট্টি সম্পাদিত, পুনা, ১৯৮২

কুন্তক : বক্রোক্তিজীবিতম্, কে. কৃষ্ণমূর্তি সম্পাদিত, কর্নাটক বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭

কেশব মিশ্র : *অলংকারশেখরঃ*, অনন্তরাম শাস্ত্রী বেতাল সম্পাদিত, বারানসী, ১৯২৭

দণ্ডী : *কাব্যাদর্শঃ*, রঙ্গাচার্য রেড্ডী সম্পাদিত, ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা মন্দির, ১৯৭০

দেবেশ্বর : *কবিকল্পলতা*, পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০০

বামন: *কাব্যালংকার সূত্রবৃত্তিঃ*, বেচন ঝা সম্পাদিত, বারানসী, ১৯৭৬

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : *কাব্যকৌতুক*, কলিকাতা, ১৩৬৩

ভরত : *নাট্যশাস্ত্রম্* (কাশী সংস্করণ), পণ্ডিত বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত, বারানসী, ১৯৮০

ভামহ : *কাব্যালংকারঃ*, বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮১

মম্মট ভট্ট : *কাব্যপ্রকাশঃ*, রঘুনাথ দামোদর কারসারকার সম্পাদিত, পুনা, ১৯৬৫

রাজশেখর : *কাব্যমীমাংসা*, সি. ডি. দালাল ও আর. অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, বরোদা, ১৯১৬

রুদ্রট : *কাব্যালংকারঃ*, মোতীলাল বনারসী দাশ, দিল্লী, ১৯৮৩

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল পাল সম্পাদিত : *সমালোচনা-সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৩৭০

শ্রীকৃষ্ণকবি : *মন্দারমকরন্দচম্পূ*, পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পন্‌সীকার সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর, ১৯২৪

টীকা

১ সালংকারগুণৌ কাব্যং শব্দার্থৌ দোষবর্জিতৌ।
তথা কবীনাং সময়ানুরোধেন নিবন্ধিতম্।।
মন্দারমকরন্দচম্পূ, পৃ ১৮৬